ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

পৃথিবীর মানুষ অধিকাংশই পথহারা, দিক-দিশাহারা। নিরীশ্বরবাদ, বহুশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে সঠিক পথহারা। বহু মানুষ রয়েছেন যাঁরা পথের দিশা পেতে চান। সাড়া দিতে চান সত্যের আহ্বানে। কিন্তু ভুল করে বসেন পথ চিনতে, বিভ্রান্তিতে পড়েন সত্যকে জানতে। আর কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেও কোন কারণ বা স্বার্থবশতঃ তার অপলাপ করেন। তাঁরা যে জ্ঞানী নন তা নয়। তবে তাঁদের জ্ঞানের উপর যে বিভ্রান্তির প্রলেপ আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এমন কিছু প্রলেপ দূর করার লক্ষ্যে এই পুস্তিকার অবতারণা। জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মাত্রই এতে জ্ঞান ও চিন্তার খোরাক এবং সত্যের তথা সৎপথের সন্ধান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। পরন্তু আল্লাহ যাকে সৎপথে আনার ইচ্ছা করেন সত্যের জন্য তার হৃদয়-মনকে উন্মুক্ত করে দেন, সমাধান করে দেন তার সকল সমস্যার।

তাই আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন পথহারা মানুষের মনকে সকল প্রকার জটিলতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছ করে ঈমানী আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

১৩/৫/১৪১৯হিঃ, ৪/৯/১৯৯৮ ইং

কে আপনাকে দুনিয়ায় আনল?

এমন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে জ্ঞানী সকল কি মনে করেন, যে ব্যক্তি নিজেকে এক অপরিচিত শহরে অথবা মরুভূমিতে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ ছাড়াই স্থানান্তরিত পায়? এবং একথা জানে যে, তাকে এস্থানে কে এনেছেন। আর যিনি তাকে এ শহর বা মরুতে এনেছেন তাঁর তরফ থেকে তার নিকট পথ প্রদর্শক ও পরিচায়ক রূপে দূতও এসেছেন। কিন্তু সে তাঁদের সাথে কোন পরিচয় করে না; যাঁরা তাকে পথ প্রদর্শন ও বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তার নিকট এসেছেন। উপরন্তু সে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাঁরা তার অত্যাচার নিরবে সহ্য করেন। সে তাঁদেরকে গালি দেয় অথচ তাঁরা তাকে নিকট করতে চান।

জ্ঞানী অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, এই নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যাকে অজানা দেশে আনা হয়েছে তার প্রথম ওয়াজেব কর্তব্য, তাঁকে চেনা যিনি তাকে তার ইচ্ছা ছাড়াই এই অপরিচিত স্থানে আনীত করেছেন এবং এখানে আনার পশ্চাতে হিকমত ও যুক্তিই বা কি? কেন তাকে এ স্থানে আনা হল? যদি ঐ দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ হয় যাঁরা তাকে পথ প্রদর্শন করবেন বলে শুনেছে তবে তার উচিত তাঁদের সত্যবাদিতা পরীক্ষা করা। সুতরাং যদি তার নিকট তাঁরা আস্থাভাজন হন তবে তাঁদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্য করা উচিত।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের বিষয়ে যত্নবান নয়, যিনি তাঁকে এনেছেন তাঁর বিষয়েও কোন গুরুত্ব দেয় না এবং তাঁর তরফ থেকে আগত দূতদের ব্যাপারেও কোন মনোযোগ দেয় না সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিজের আহম্মুকি ও মূর্খতায় বাস করে।

জ্ঞানী যদি জ্ঞান করে দেখে যে, এ পার্থিব জীবন কি? কেমন করে সে মৃত মাটি ছিল অতঃপর পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হল? "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।" *(কুঃ ৩০/২০ আয়াত)*

কত পার্থক্য এই মৃত মাটির মধ্যে যে না শুনে, না দেখে, না বুঝে, না হিলে, না অনুভব করে, না বাড়ে, না জন্ম দেয় আর না জীবনের গুণাবলীর কোন গুণে গুণান্বিত এবং এই জীবিত চলে-ফিরে ভ্রমণকারী মানুষের মধ্যে যে পৃথিবীকে আন্দোলন ও সজীবতায় পরিপূর্ণ করেছে। জ্ঞানী যদি এই জীবের মৃতমাটির জগৎ থেকে মানব জগতের আসার কাহিনী চিন্তা করে এবং ভাবে যে, কেমন করে মাটি খাদ্যের মাধ্যমে নিকৃষ্ট পানির শুক্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে? অতঃপর কি রূপে ঐ শুক্রবিন্দু জমাট রক্ততে, অতঃপর তা পিণ্ডে এবং তারপর অস্থি-পঞ্জরে পরিণত হয়েছে, অতঃপর তাকে মাংস দ্বারা আবৃত করা হয়েছে, আর কি ভাবেই বা জীবন ও আত্মা মানুষের ভ্রূণে প্রবিষ্ট হয়েছে? কি রূপেই বা শিশু হয়ে বহির্গত হয়েছে অতঃপর হয়েছে পূর্ণ মানব।

যদি সে এসব কিছুর পশ্চাতে সুচিন্তা করে তাহলে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এসবের পিছনে তার নিজস্ব কোন এখতিয়ার ও

ইচ্ছা ছিল না। এবং জানতে পারবে যে, তার উপর প্রথম ওয়াজেব হচ্ছে তাঁকে চেনা যাঁর হাতে তার জীবন ও অস্তিত্বের এবং লালন-পালন ও আকৃতির ডোর রয়েছে; যিনি মানুষকে তার বিনা অনুমতি ও এখতিয়ারে পৃথিবীতে এনেছেন। "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" *(কুঃ ৮২/৬-৮)*

অতএব হে মানুষ! কে আপনাকে আপনার প্রতিপালক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে? যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দর আকৃতি প্রদান করেছেন। আপনি কি মনে করেন যে, আপনি নাস্তি থেকে এসেছেন? এবং নাস্তি; যার কোন অস্তিত্ব নেই সেই কি আপনার আকৃতি বিন্যস্ত করেছে? আপনি কি জানেন না যে, নাস্তি কিছু সৃষ্টি করতে পারে না? আর একথা তো জানেন যে, আপনি নিজেও নিজ দেহের কিছু অংশও সৃষ্টি করেননি। সুতরাং নিশ্চয় আপনার কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। "ওরা কি বিনা কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে অথবা ওরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?" *(কুঃ ৫২/৩৫)*

অতএব যদি আপনার অস্তিত্ব, জীবন ও সৃষ্টির ডোর সেই আল্লাহর হাতে থাকে যিনি আপনাকে রূপ দান করেছেন এবং আপনার আকৃতি বিন্যস্ত করেছেন তাহলে আপনার জন্য জরুরী যে, আপনি তাঁকে জানুন যাঁর হাতে আপনার সর্ববিষয় রয়েছে এবং যাঁর হাতে আপনার অস্তিত্ব রয়েছে। আপনি তাঁর ইচ্ছার বন্ধক। তাই তো আপনার প্রতিপালককে চেনা আপনার প্রথম ওয়াজেব হওয়া আবশ্যিক হে জ্ঞানী!

আমরা কার মালিকানায়?

এই হাত যার দ্বারা আপনি কর্ম করে থাকেন। এই পা যার দ্বারা চলা-ফেরা করে থাকেন, জিব যার দ্বারা আপনি কথা বলে থাকেন, জ্ঞান যার দ্বারা আপনি বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে থাকেন, চিন্তা করে থাকেন, ভালো-মন্দ বেছে থাকেন এবং প্রত্যেক সেই অঙ্গ যার দ্বারা আপনি আপনার দেহ ও জীবনে ব্যবহার করে থাকেন এবং তার দ্বারা উপকার লাভ করে থাকেন সে সবের মালিক কে?

বরং আপনি নিজে কার মালিকানায় এবং আমাদের সকলের মালিক কে?

অধিকৃত বস্তুকে স্বাধীনরূপে ব্যবহার যে করতে পারে সেই তার প্রকৃত অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়। তাহলে আপনি কি নিজেই এ পৃথিবীতে আসাকে এখতিয়ার করেছেন? আপনি কি নিজেই আপনার বাপ-মা পছন্দ করেছেন? নিজেই কি আপনি আপনার জন্মভূমি বেছে নিয়েছেন? অথবা আপনার জন্ম সময় আপনি নিজেই মনোনীত করেছেন? আপনি কি নিজেই আপনার রূপ-রঙ-বর্ণ, দৈহিক-মানসিক ও জ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় গুণাবলী নির্বাচন করেছেন? আপনি কি নিজেই মনোনয়ন করেছেন যে, আপনি পুরুষ হবেন অথবা নারী? আর আপনি কি নিজের জন্য এ পছন্দ করেছেন যে, আপনি শক্তিমান যুবাবস্থার পর বৃদ্ধাবস্থার দুর্বলতায় ফিরে যাবেন? জ্ঞানের পর জ্ঞানহীনতায়, সুস্থতার পর অসুস্থতায়

এবং জীবনের পর মৃত্যুর দিকে ফিরে যাবেন? "আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে দূর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর পুনরায় দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" *(কুঃ ৩০/৫৪)*

এইগুলিই তো আপনার আসল গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। যার কিছুরই আপনি মালিক নন। যেহেতু এগুলির একটাও আপনি নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনরূপে ব্যবহার করতে পারেন না। আবার আপনি কি আপনার সন্তানদের ব্যাপারে ঐ ইচ্ছা ব্যবহারের অধিকারী? অর্থাৎ আপনি আপনার সন্তানের জন্য উপর্যুপরি কোন একটা গুণ মনোনীত করতে পারেন? আপনার সন্তানের জন্য অথবা আপনার আত্মীয়, আপনার গোত্র, আপনার স্বদেশ, আপনার জাতি-গোষ্ঠীর জন্য কিছুও কি এখতিয়ার করতে পারেন? আর বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র অথবা জাতি-গোষ্ঠী কি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে আমি, আপনি ও সমস্ত মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বস্তুসমূহের কিছুও নিজেদের জন্য বেছে নিতে পারে?

কক্ষনই না। এ স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি কারো নেই।

সুতরাং আপনি অধীনস্থ --- আমিও অধিনস্থ এবং এই সারা জাতি, গোষ্ঠী, শাসক রাজা ও শাসিত প্রজা সকলেই সেই সত্তার অধীনস্থ যিনি তাদেরকে যেমন ইচ্ছা তেমনি রূপে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদেরকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করেছেন। আর সকল সৃষ্টজীবকে সেই রূপ, গুণ-সামর্থ্যাদি দান করেছেন যা সকলের জন্য উপযুক্ত।

অতঃপর হে জ্ঞানী! আপনি আপনার হাত অথবা পায়ের কথা চিন্তা করে দেখেন, আপনি কি তার মাংস অথবা অস্থি অথবা রক্ত কিংবা একটি লোমও সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর ভেবে দেখুন, আপনি কি অপরের জন্য তার দেহ অথবা প্রকৃতির কিছুও সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর চিন্তা করুন, কোন জাতি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কি আপনার অথবা আর কারো জন্য কিছুও কি সৃষ্টি করেছে? "নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর তারাও তোমাদের মতই (আল্লাহর) দাস।" *(কুঃ ৭/১৯৪)*

কোন দোকান, কারখানা, খেত অথবা অফিসের মালিক যদি কিছু সময়ের জন্য দোকানাদি ছেড়ে রাখে এবং এক ব্যক্তি তা দেখে সেই দোকান বা কারখানায় প্রবেশ করে ইচ্ছামত আচরণ করতে শুরু করে, খেত বা অফিসের আসবাবপত্র নিয়ে যাচ্ছে তাই ভাবে উল্টাপাল্টা করতে লাগে। আগের জিনিস পিছে, পিছের জিনিস আগে করে, কিছু উপরে রাখে আর কিছু নিচে এবং ঐ দোকান, কারখানা, খেত বা অফিসের মালিকের বিনা অনুমতিতেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন মালপত্র স্থানান্তরিত করতে থাকে তাহলে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি?

নিশ্চয় প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এমন উচ্ছৃঙ্খল লোককে - যে অপরের মালিকানার জিনিসপত্র নিয়ে মালিকের অনুমতি ছাড়াই এমন আচরণ করে -তাকে পাগল বা নির্বোধ বলে অবহিত করবেন।

এখন আপনি নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখেন, আপনি কি সেই

নির্বোধদের মধ্যে পরিগণিত যারা মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার আসবাবপত্রে অনধিকার যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে?

মোট কথা, জ্ঞানী মাত্রই চিন্তা করলে নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, তিনি নিজের দেহ বা আত্মার কিছুরই মালিক নন। সুতরাং তাঁর কর্তব্য, সেই দেহ বা আত্মার মালিককে না চিনে এবং তাঁর অনুমতি, আদেশ ও নির্দেশনা না নিয়ে তাতে তার কোন স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ না করা। "জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান কেবল তাঁরই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব প্রতিপালক।" *(কুঃ ৭/৫৪)*

এ জন্যই তো মানুষের উপর প্রথম ওয়াজেব হল তার মালিককে চেনা এবং তার প্রতি তার মালিক ও প্রতিপালকের প্রেরিত দূতকে চেনা।

আমরা কেন সৃষ্ট হয়েছি?

পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারগণকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, মানুষের চক্ষু কি কোন হিকমত ও কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? সকলেই উত্তরে বলবেন, 'নিশ্চয়।' আর যে ব্যক্তি চক্ষুর হিকমতকে মিথ্যা মনে করে সে তার চক্ষুদ্বয়কে উৎখাত করে দেখুক।

যদি আপনি তাঁদেরকে মুখ, দাঁতসমূহ, দুই কান, নাক, দুই হাত , দুই পা, হৃদয় (হার্ট), দুই ফুসফুস, প্রত্যেক ছোট ছোট উপশিরা বা কোষ ইত্যাদি মানুষের দেহে বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে,

'এসব কি কোন হিকমতে সৃষ্টি করা হয়েছে?' অবশ্যই তাঁরা সকলেই উত্তর দেবেন, 'নিশ্চয়ই।' আর যদি তাঁদেরকে ঐসব অঙ্গের বিস্তারিত কর্ম ও ফাংশন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ফিজিওলজিক হলেও উত্তর দেবেন, 'এর জন্য আমাদের শত-শত বৎসরের দরকার। তবেই হয়তো আমরা মানব দেহের সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে সক্ষম হব।'

আর যদি আপনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'মানবদেহের একটি অঙ্গের হিকমত (সৃষ্টিযৌক্তিকতা) সমস্ত দেহের সাথে জড়িত কি?' নিশ্চয় তাঁরা উত্তরে বলবেন, 'হ্যাঁ, মুখের হিকমত দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য খাওয়া, দুই ফুসফুসের হিকমত সারা দেহের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা, হার্টের হিকমত সারা শরীরে রক্ত পরিচালনা করা, দুই পায়ের হিকমত সারা দেহ নিয়ে চলা-ফেরা করা এবং অনুরূপ দেহের প্রত্যেক অংশই সমস্ত দেহের জন্য তার নিজের দায়িত্ব পালন করে।

সুতরাং যদি আপনার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ বিভিন্ন হিকমতের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপনার সারা শরীরের খিদমতের জন্য সুনিপুণ হিকমত ও কৌশলে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে আপনিও কোন হিকমতে সৃষ্টি হয়েছেন? অর্থাৎ আপনার সৃষ্টির পশ্চাতেও বিরাট হিকমত ও যুক্তি অবশ্যই আছে।

অতএব আপনি কি জানেন সে হিকমতটি কি? কেন আপনি সৃষ্টি হয়েছেন? কেন সমস্ত মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে?

যদি আপনি আপনার সৃষ্টির পশ্চাতে হিকমত না জানতে পারেন তাহলে নিশ্চয় আপনি নিজের হাতে এই কাগজ অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। কারণ, এই কাগজ সৃষ্টির পিছনে হিকমত আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, তার উপর লিখা হবে। কিন্তু আপনার সৃষ্টির পিছনে আপনার দৃষ্টিতে কোন হিকমত নেই! অতএব আপনি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন, কিরূপে আপনি সংসার করছেন অথচ আপনি নিজের সৃষ্টির কারণ জানেন না? যে তার আশপাশে স্থিত বস্তুসমূহের হিকমত জানে না, কি কারণে এসব বস্তু নির্মিত হয়েছে তা জানে না সে লোক তো বড় উদাসীন। যে তার দেহে পরিহিত পরিচ্ছদের পিছনের হিকমত বুঝে না সে তার চেয়েও অধিক গাফেল। যে ব্যক্তি তার চোখ, মুখ, হাত অথবা পা সৃষ্টির পিছনে যুক্তি জানে না সে ঐ দুই ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর অধম। কিন্তু পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় গাফেল ও অধম সেই ব্যক্তি যে তার সমস্ত দেহ-সৃষ্টির পশ্চাতে হিকমত বুঝে না এবং তার সারা জীবনের পশ্চাতে উদ্দেশ্য জানে না! ধরাপৃষ্ঠে তার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে অথচ সে জানতে পারবে না যে সে কেন জীবনধারণ করে পৃথিবীতে বাস করছিল? আর কেন সে মরবে? এমন মানুষের জীবন তার নিজের পায়ের দুই জুতা অপেক্ষাও অধম। যেহেতু জুতা সৃষ্টির পিছনে হিকমত আছে। কিন্তু তার নজরে তার সারা জীবনের পশ্চাতে কোন হিকমত নেই! বরং সমগ্র মানবকুল সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নেই। "যারা কাফের তারা ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদরপূর্তি

করে তাদের নিবাস
হল জাহান্নাম।” *(কুঃ ৪৭/১২)* যেমন কবি বলেন,

‘এসেছি, তবে জানি না আমি এসেছি কোথা হতে,
চোখের সামনে পথ দেখেছি চলিতেছি সেই পথে।
এমনি ভাবে চলতে র’ব ইচ্ছে আমার যত,
কোথায় যাব তাও জানিনে পথই বা আর কত?’

এসেছি বাস্। কেমন করে এসেছি? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি?
কেমন করে পথ দেখেছি ? কোথায় যাব? এসব আমি কিছুই জানি না। কেন জানি না? তা-ও জানি না।

একজন গাড়িচালককে পথিমধ্যে থামিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘আপনি কোথা থেকে আসছেন?’ সে উত্তরে বলল, ‘জানি না।’ আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় যাবেন?’ সে বলল, ‘জানি না।’ পুনরায় তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন এসেছেন বা এদিকে কি জন্য যাবেন?’ সে বলল, ‘কি জানি?’ আপনি বললেন, ‘কেন জানেন না?’ সে বলল, ‘তাও জানি না!’ তাহলে এমন লোককে নিশ্চয় আপনি পাগল ভাববেন নচেৎ মাতাল। আর সম্ভবতঃ এমন লোক যে রাস্তায় ট্রাফিক-পুলিশের কাছে ধরা খেয়ে জেলে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু পথভ্রষ্টরা নিজেদের অস্তিত্বের পশ্চাতে হিকমত না জানলেও আমরা মুসলিমরা তা জানি। আর তারা একথাও জানে না যে, তারা কেন জানে না। যেহেতু নির্মিত বস্তুর পশ্চাতে হিকমত ও

উদ্দেশ্য নির্মাতার হৃদয়ে গুপ্ত থাকে। যা তার জ্ঞাপনের ফলে জানতে পারা যায়। তদনুরূপ মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে হিকমত স্রষ্টার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে যা আমরা জানতে পারিনা। যা তাঁরই নিকট থেকে হিকমত জ্ঞাপক দূত ও জ্ঞান দ্বারা জানতে পারা যায়।

তাই মানুষ ততদিন পর্যন্ত তার নিজের অস্তিত্ব সৃষ্টির পিছনে হিকমত জানতে পারে না যতদিন না সে তার স্রষ্টার নিকট থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। সে জ্ঞান ততদিন পেতে পারে না যতদিন না সে স্রষ্টাকে ভালোরূপে চিনেছে। আর যতদিন সে তার স্রষ্টাকে না চিনবে ততদিন তার মর্যাদা নিজের কাছেই অধঃপতিত থাকবে। পরন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সে নিজেকে কোন বাক্‌সক্ষম জন্তু অথবা Beetle মনে করতে পারে। অথচ তার প্রতিপালক তাকে ডাক দিয়ে বলেন, "আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদেরকে উত্তম জীবনাপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।" *(কুঃ ১৭/৭০)* কিন্তু মানুষ তা মানতে অস্বীকার করে এবং নিজের জন্য নিকৃষ্টতাই পছন্দ করে!

এসব কিছুর কারণেই। মানুষের প্রথম ওয়াজেব হল আল্লাহকে চেনা ও তাঁর রসূলকে জানা।

আমরা কি নিরুদ্দিষ্ট?

মানুষ যদি মানবজাতির জীবন নিয়ে চিন্তা করে তাহলে দেখবে, তাদের অধিকাংশের জীবন সাক্ষি দেয় যে, তারা উদ্‌ভ্রান্ত ও নিরুদ্দেশভাবে বাস করছে। যেহেতু নিরুদ্দিষ্ট ও ভ্রান্ত মানুষদের লক্ষণ ও চিহ্ন হচ্ছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, তারা তাদের চলার পথে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, হৃদয়গহ্বরে তারা দ্বিধাগ্রস্ত, আবেগ ও অনুভূতিতে তারা উদ্বিগ্ন; তাদের দলীল ধারণা, কল্পনা ও বাসনা। এবং এরূপই অধিকাংশ মানুষের জীবন।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রায় রাষ্ট্র মতভেদ ও উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বের মাঝে পরিচালিত হচ্ছে এবং অনুরূপভাবে ঐ রাষ্ট্রের ভিতরে সকল পার্টি, সংস্থা, দল ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বাস করেছে। এমন কি একই দল ও সংস্থার মাঝে বিভিন্ন উপদল ও শাখা অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আত্মকলহে লিপ্ত রয়েছে। এইভাবে সর্বস্থানে দ্বন্দ্ব ছেয়ে আছে, যেন জীবনের পুরোটাই দ্বন্দ্বপূর্ণ ও নিরুদ্দিষ্ট।

কিন্তু এ দ্বন্দ্বের রহস্য কি? যদি আমরা এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করি তাহলে দেখতে পাব যে, মতদ্বন্দ্বের কারণ মানুষের তত্ত্বজ্ঞান ও অভিমতের অনৈক্য। আর যদি আমরা মানুষের তত্ত্বজ্ঞান ও অভিমতের অনৈক্যের কারণ বিশ্লেষণ করি তাহলে জানতে পারি যে, নিম্নের বিষয়গুলিতে মতানৈক্যের কারণে তা ঘটে থাকে;

১-মানুষের তরবিয়ত ও শিক্ষায় তারতম্য ও অনৈক্য; যা রায় প্রকাশে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে।

২-মানুষের চরিত্র ও আচরণের পার্থক্য ও ভিন্নতা।

৩-মানুষের সমঝ ও জ্ঞানের তারতম্য।

৪-মানুষের অভিজ্ঞতায় কমবেশী।

৫-মানুষের স্বার্থ ও মঙ্গল-চিন্তার ভিন্নতা ইত্যাদি অভিমত ও রায় বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে।

সুতরাং প্রত্যেকের রায় তার শিক্ষা, চরিত্র, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্বার্থের উপর নির্ভরশীল হয়, সমস্ত মানুষ যদি এসমূহে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং দুয়ের শিক্ষা, চরিত্র বিবেক-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও স্বার্থ ইত্যাদির মধ্যে সমতা পাওয়া অসম্ভব হয় তাহলে মানব জাতির জন্য এটাও অসম্ভব যে, তারা সকলে একমত হবে। তবে যদি তারতম্য সত্ত্বেও আমরা অভিমত ও রায়কে এক করে নি তাহলে সম্ভব।

কিন্তু সকলের রায় ও মতবাদও এক হওয়া সম্ভব নয় যদি না আমরা সমগ্র মানুষকে এক করতে পারি, তাদের শিক্ষা ও তরবিয়ত, আচরণ ও ব্যবহার, বোধ ও বিবেক, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থ ও কল্যাণ-চিন্তাকে অভিন্ন করতে পারি। আর তা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং মানুষের মাঝে মতভেদ থাকবেই। আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক যাদের প্রতি দয়া করেন তারা নয়---।" *(কুঃ ১১/১১৮-১১৯)*

তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি ?

এর একমাত্র সমাধান হল এই যে, মানুষ চিনুক যে তার এক

সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি সর্ববিষয়েই সর্বজ্ঞ। সকল বস্তুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। যাঁর পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলী আছে এবং উত্তম নামাবলী আছে। তিনি এমন সূক্ষ্মজ্ঞ যে, তাঁর জ্ঞান হতে সামান্য কিছুও না গুপ্ত হয়েছে, না হয়, আর না কক্ষনো হতে পারবে। তিনিই দয়াবান প্রভু যাঁর সম্মুখে তাঁর দাসত্বে সকল মানুষ সমান। তিনিই সকল প্রকার ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। "তিনি তাঁর দাসদের কুফরী পছন্দ করেন না।" *(কুঃ ৩৯/৭)*

সুতরাং মানুষ যখন তাঁর প্রভু ও প্রতিপালককে চিনতে পারবে এবং তাঁর পথনির্দেশ অনুসন্ধান করে অনুসরণ করবে তখন সে এই মতদ্বন্দ্ব থেকে বের হয়ে নিস্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হবে, এর তিক্তফল থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারবে এবং সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ দাস হয়ে, প্রভুর রশিকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়রূপে ধারণ করে তার পথনির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে। আল্লাহ পাক বলেন, "আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যই এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।" *(কুঃ ১৬/৬৪)*

অতএব মানুষ মতভেদ ও দ্বন্দ্বের ঘূর্ণিপাক থেকে ততদিন পর্যন্ত বের হতে পারে না যতদিন না সে তার প্রভু ও প্রতিপালককে চিনেছে। আর এজন্যই মানুষের প্রথম ওয়াজেব, তার প্রতিপালককে জানা।

যখন আমরা মৃত্যুর পর কি হতে পারে অথবা আগামী কাল কি ঘটতে পারে মানুষের মনে এই আশঙ্কাবোধের রহস্য বিষয়ে

চিন্তা করে দেখি এবং যখন আমরা সেই উদ্বিগ্নের কথা ভেবে দেখি যা বর্তমান যুগের কাফেরদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে তখন আমরা এর মূল রহস্য এই দেখতে পাই যে, তারা দুনিয়াতে বাস করছে কিন্তু তাদের জীবনের তারা কোন অর্থ বুঝে না। তারা জানে না যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তা জানলেও স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার পথ তারা চেনে না। এবং এও জানে না যে, মৃত্যুর পর তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে?

সুতরাং তারা দুর্বিনীতভাবে জীবন-যাপন করে থাকে অথচ তারা উদ্বিগ্ন, শান্তির পরশ পায় না। আর মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনে শান্তি এবং তৃপ্তি পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের প্রভুকে চিনেছে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" *(কুঃ ২৭/৩০)*

এ জন্যেই মানুষের উপর প্রথম ওয়াজেব হল, তার প্রতিপালক ও স্রষ্টাকে চেনা। *(তরীকুল ঈমান ৩- ১৭পৃঃ)*

আজব সৃষ্টি

যদি দেহ-সৃষ্টির উপর চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আপনার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গকে আপনার সৃষ্টিকর্তা এক একটি বিদিত হিকমত ও কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এবং যে কাজের জন্য যে অঙ্গকে সৃষ্টি করেছেন তা পালনের জন্য তার সহিত বড় সামঞ্জস্য বজায় রেখে সৃষ্টি করেছেন।

আপনার চক্ষুদ্বয়ের উপর চিন্তা করুন আপনার কর্ণদ্বয়, পাকস্থলী ইত্যাদির উপর ভেবে দেখুন, কেমন তা তাদের কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেমনরূপে আল্লাহ এ অঙ্গসমূহকে তাদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়ে প্রকৃতি দান করেছেন। এটা দর্শন করে, ওটা শ্রবণ করে, তৃতীয়টা খাদ্য পরিপাক করে ইত্যাদি। অথচ সবগুলিই একই আহার ও পানীয় থেকে কর্মশক্তি লাভ করে থাকে।

মানুষের উদর এক আজব কারখানা। এর এক এক অঙ্গের এক এক কাজ। যেমন যকৃৎ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। পিত্তাশয় তৈল ও চর্বিযুক্ত খাদ্য হজমে সহায়তা করে ইত্যাদি। এ সব কিছু মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যায়।

হার্ট বা হৃৎপিন্ডের কথাই ধরা যাক। যা আকারে দেখতে প্রায় পেয়ারার মত। আয়তনে হাতের মুঠিতে এসে যায়। ওজনে ২২৫ থেকে ৩৪০ গ্রাম ভারী। যা মানুষের বুকে প্রতিনিয়ত স্পন্দশীল।

এক মিনিটে ৭০ বার স্পন্দিত হয় এটি। প্রতি ঘন্টায় ৪২০০ বার, প্রত্যহ ১০০৮০০ বার, বছরে ৩৬৭৯২০০০ বার। সুতরাং কোন মাঝারি বয়সী ৬০ বছরের মানুষের বুকে এই বিস্ময়কর হার্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে ২২০৭০০০০০০ (দুইশত কুড়ি কোটি ৭০ লাখ) বার কম্পিত হয়!

আবার এই হার্টই প্রত্যহ ২২০০০ গ্যালন রক্ত সারা দেহে সঞ্চালন করে, এক বছরে করে ৮০৩০০০০ গ্যালন, অর্থাৎ মাঝারি বয়সী ৬০ বছর আয়ুপ্রাপ্ত লোকের হার্ট ৪৮১৮০০০০০ গ্যালন রক্ত সঞ্চালিত করে থাকে; যে রক্ত-সমষ্টির ওজন হয় প্রায় ৩৪৫০০০ টন।

ভাবতে পারেন কি, এছাড়া দ্বিতীয় কোন ভিন্ন সঞ্চালক যন্ত্র এমন কঠিন কাজ এত লম্বা সময় ধরে অবিরামভাবে কোন মেরামতির প্রয়োজন ছাড়াই করে যেতে পারে?

মানুষের দুই ফুসফুসের মধ্যে ৩৭৫ মিলিয়ন বায়ুরন্ধ্র আছে। শ্বাসকার্যের জন্য এই বায়ুরন্ধ্রে মানুষ প্রত্যহ ১৮০ বর্গমিটার হাওয়া টেনে থাকে! যা হতে এত শক্তির সৃষ্টি হয় যে, তার দ্বারা একটি রেল ইঞ্জিনকে প্রায় ২মিটার ঊর্ধ্বে তোলার জন্য যথেষ্ট হবে!

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ৫০ কেজি ওজনবিশিষ্ট মানুষের দেহে রক্তবাহিকা শিরা-উপশিরা এত পরিমাণে ছড়িয়ে আছে যে, এসবের সর্বমোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধিকে প্রায় আড়াই বার বেষ্টন করার জন্য যথেষ্ট! (প্রকাশ যে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় মোট পরিধি হল ৪০০৭৫ কিমি।) পরন্তু

উক্ত শিরা-উপশিরার বাহ্যিক
আয়তন (ক্ষেত্রফল) দাঁড়াবে প্রায় ৬৩০০ বর্গমিটার!

সাবালক মানুষের পেটে দুই কিড্‌নি প্রত্যহ অর্ধবর্গমিটার রক্ত শোধন করে। এই কিড্‌নিদ্বয় বহু সূক্ষ্ম রক্তসংবাহিকা শিরা উপশিরার সাথে সংযুক্ত। যার সংখ্যা প্রায় দুইশত মিলিয়ন (২০ কোটি) এবং এক একটার দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার। যার মোট দৈর্ঘ্য হবে দশহাজার কিলোমিটার। অর্থাৎ ভূগোলকের এক চতুর্থাংশ পরিধি পরিমাণ!

মানুষের দেহে যে পরিমাণ আয়রন আছে, তা দিয়ে ৭টি পেরেক তৈরী করা যাবে। যে পরিমাণ কার্বন আছে, তা দিয়ে ৬৫ ডজন (৭৮০টি) কলম (পেনসিল) তৈরী করা যাবে। প্রায় ২০ চামচ লবণ আছে। ৫০ টুকরা চিনি আছে এবং প্রায় ৪২ লিটার পানি আছে।

সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! তিনি বলেন, "নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? " *(কুঃ ৫১/২০-২১)*

ভেবে দেখুন ডালিম গাছ, গম ও খেজুর গাছের কথা। কেমন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট আকার ও নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ফল সৃষ্টি করেছেন। কেমন তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ ফল উৎপাদনের নির্দেশ দান করেছেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশিষ্ট কাণ্ড, শাখা ও ফুল-ফলের আকৃতি গ্রহণ করাকে প্রকৃতিগত করেছেন? অথচ সবগুলিই একই উপাদান থেকে জীবিত থাকে ও বাড়ে। তিনি বলেন, "ভূমির পরস্পর অংশ সংলগ্ন, ওতে আছে

দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা একক শির-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; এসব একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় এবং ফলের হিসাবে আমি ওদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।" *(কুঃ ১৩/৪)*

ভেবে দেখুন মৎসশ্রেণীর জীবন-কথা। পক্ষীকুল, পিপিলিকাদল ও সংখ্যাতীত জীবাণু এবং যাবতীয় প্রাণী জগতের প্রাণ ও জীবনের কথা চিন্তা করে দেখুন। কেমন তিনি একই উপাদান হতে তাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য বিভিন্ন স্থানসমূহে ভিন্ন ভিন্ন জীবন ধারা নির্ধারিত করেছেন। প্রত্যেকের জন্য তার সুসমঞ্জস প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন এবং তার মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষকে নির্দেশ করেছেন পক্ষীকে বহন করতে, ফুলকোকে নির্দেশ করেছেন, মৎসের জন্য পানি থেকে সঞ্জীবনী অক্সিজেন সংগ্রহ করতে। অনুরূপ প্রত্যেক অঙ্গকে নির্দিষ্ট কার্যভার অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সমস্ত জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; ওদের কিছু উদরে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে চলে এবং কতক চলে চারপায়ে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(কুঃ ২৪/৪৫)*

যদি আপনি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপর চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, প্রত্যেককেই তিনি বিশিষ্ট আয়তন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেককে যথোচিত স্থানে সজ্জিত করেছেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ আয়তন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের

সুশৃঙ্খল প্ররিভ্রমণ কক্ষপথ নির্ধারিত করেছেন। যার ফলে নভোমণ্ডল হয়েছে সুশৃঙ্খলিত।

পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন আকর্ষণ শক্তি । যার দ্বারা পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। যে আকর্ষণশক্তি না থাকলে আমরাও শূন্যে ভাসমান হতাম। মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি। সূর্যের মাঝে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন যার ফলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মাঝে শূন্যে সঠিক কক্ষপথে স্থির থাকে। এই মধ্যাকর্ষণ যদি না থাকত তাহলে আমরা কোন্ দিন ভারসাম্য হারিয়ে পৃথিবীর সাথে সূর্যের দিকে ধাবিত হয়ে দগ্ধীভূত হয়ে যেতাম। নচেৎ বিকর্ষণের ফলে সূর্য থেকে আমরা বহুদূরে সরে যেতাম; অথচ সূর্য ছাড়া আমাদের জীবন-যাপনই অসম্ভব হত। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাধীন। "আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি তাঁর নিদর্শন সমূহের এক নিদর্শন।" *(কুঃ ৩০/২৫)*

আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়, ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ওগুলিকে স্থির রাখতে পারে না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" *(কুঃ ৩৫/৪১)* "এবং তিনি আকাশকে স্থির রাখেন; যাতে তা পৃথিবীর উপর -তাঁর অনুমতি ভিন্ন- পতিত না হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" *(কুঃ ২২/৬৫)*

সুতরাং একটি গ্রহ বা নক্ষত্র যদি স্থানচ্যুত হয় অথবা সূর্য বা চন্দ্র যদি কক্ষচ্যুত হয় তবে নিশ্চয় মহাকাশ তথা সারা বিশ্বের শৃঙ্খলতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

যে ব্যক্তি এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে সে জানতে পারবে যে, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে আবিষ্কার ও সৃজন করেছেন তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার নির্ধারিত ও উপযুক্ত প্রকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর; যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন এবং যিনি ওদের বিকাশ-সাধন ও পথ-নির্দেশ করেছেন।” *(কুঃ ৮৭/১-৩)*

তিনি তাঁর নবী মূসা (আঃ) এর কথা বর্ণনা করে বলেন, “সে বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি -যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।” *(কুঃ ২০/৫০)*

কাফেরদের ঔদ্ধত্য

সত্য অস্বীকারকারী অবিশ্বাসী, যে আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, তাঁর হেদায়াত ও পথ-নির্দেশকে অপছন্দ করে, শয়তান যার কর্মকে সুশোভিত করে তার স্বার্থ তো ঈমানের বিরোধিতা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই-এ। তার আশঙ্কা থাকে যে, যদি ঈমান জয়লাভ করে তবে তার বহু স্বার্থ বিনষ্ট ও আঘাতপ্রাপ্ত হবে। অথবা এই ভয় করে যে, যদি সে ঈমানের ছায়ায় মর্যাদার জীবন অবলম্বন করে তবে তার ভ্রষ্ট জীবনের বহু প্রবৃত্তি-পরায়ণতা ত্যাজ্য হয়ে যাবে এবং মনমর্জি খেয়ালখুশীতে ব্যাঘাত ঘটবে। এমন কাফেরের জন্য অগণিত দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ মোটেই যথেষ্ট নয়। অথচ কোন

পার্থিব বিষয়ে মান্যতার জন্য একটি বা তার অর্ধেক মাত্র দলীল তার জন্য যথেষ্ট হয়। যার জন্য অনমনীয়তার সাথে তার নিজ ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষপরায়ণতায় অটল থেকে ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্দেহ ও বিতর্ক উদ্ভাবন করে। আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য নিত্যনূতন বিভ্রান্তি, ধোকা ও ধাঁধার কৌশল রচনা করে। যার জন্য দেখা যায়, এমন কাফেরকে যদি কেউ ঈমানের প্রতি আহ্বান করে তাহলে সে আহ্বানকারীকে হতভম্ব ও হতাশ করে ফেলে। আর তার উপর বিভিন্ন অসার ও অমূলক শর্তারোপ করে থাকে। ঐ শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত যা ঐ ধরনের উদ্ধত মানুষদের নিকট থেকে প্রসিদ্ধ; ওরা বলে, 'প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহকে দেখাও!'

কিন্তু এমন শর্তে কি চায় এই উদ্ধতশ্রেণীর মানুষেরা?

তারা চায় তাদের সম্মুখে তাদের মস্তকে বিন্যস্ত চক্ষুদ্বয় দ্বারা আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখতে! কিন্তু এই সীমিত দৃষ্টিশক্তিযুক্ত অসমর্থ সংকীর্ণ চক্ষু কি সেই আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হবে?

আসুন আমরা সমীক্ষা করে দেখি, সত্যই কি সেই চক্ষু সেই সুমহান প্রতিপালককে দেখার শক্তি রাখে যে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখার শর্ত কাফেররা ঈমানের জন্য আরোপ করে থাকে? চক্ষু কি বাতাসকে দেখার ক্ষমতা রাখে; যে বাতাস চক্ষুকে স্পর্শ করে এবং তার সম্মুখেই শতশত কিলোমিটার জুড়ে সুবিস্তৃত থাকে?

চক্ষু কি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে দেখতে পায়; যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী সকল বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে? চক্ষু তা দেখতে

সমর্থ কি? উত্তর, না, কক্ষনই না।

চক্ষু কি বেতারের শব্দতরঙ্গকে দেখতে পায় যা পৃথিবীর বিভিন্ন রেডিও ও টিভির বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়? তা কি দেখা সম্ভব? উত্তর, না, কোন দিনই না।

চক্ষু কি জীবদেহে অবস্থানকারী আত্মাকে দেখতে সক্ষম; যার দ্বারা জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করা হয়? চক্ষু কি সেই বুদ্ধিকে দেখতে সক্ষম; যার দ্বারা পাগল ও জ্ঞানসম্পন্নের মাঝে পার্থক্য করা যায়? তা কি দেখার শক্তি রাখে? জওয়াব, না, কোনক্রমেই না।

চক্ষু কি চুম্বকের সেই আকর্ষণশক্তি দেখতে পায়; যার দ্বারা সে লৌহখণ্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে? জওয়াব, না, কোনদিন না।

নিকট থেকে যদি চোখের উপর লাইটের আলো পড়ে তাহলে চোখ কি তা বরদাস্ত করতে পারে? উত্তর, চক্ষু জ্যোতির তীব্রতা কোনদিন সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং এই চচক্ষু ববহু নিকটবর্তী বস্তু দেখতে সক্ষম নয়। নিকটবর্তী আলোর কিরণ সহ্য করতে সমর্থ নয়। তাহলে দূর থেকে বহু দূরবর্তী বস্তুকে সীমিত ঐ চক্ষু কি দেখতে সক্ষম? অথবা দূরবর্তী আলোর কিরণ কি সহ্য করতে সমর্থ? আসুন তা একবার ভেবে দেখি।

চক্ষু কি পার্শ্ববর্তী স্থানের পশ্চাতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখতে সক্ষম? জওয়াব না, না।

চক্ষু কি পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশকে দেখতে সমর্থ? উত্তর না, না।

চক্ষু কি আকাশের সমূদয় গ্রহ-নক্ষত্রকে দেখতে সক্ষম? উত্তর না, কোন দিন না। দেখলেও কিছু সংখ্যক তারকা দেখতে পায়। আবার চাঁদের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল থাকলে আরো কম দেখতে পায়। সূর্যের আলো থাকলে তো প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। তা দেখার উদ্দেশ্যে বারবার তাকালেও দৃষ্টি
ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়েই ফিরে আসে।

চক্ষু কি মধ্যাহ্নে সূর্যের চক্রকে দর্শন করতে সক্ষম হয়? জওয়াব না, কক্ষনো না।

সুতরাং এই চোখের দৃষ্টিশক্তি পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। অতি দূরের বস্তু দেখতে অক্ষম এবং তীব্র আলোক রশ্মিও সহ্য করতে অসমর্থ, যাতে চোখ ঝলসে যায়। যেমন নিকটবর্তী বহু সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় বস্তু ও সত্তাকে দর্শন করার সাধ্য তার নেই।

এই যদি চক্ষুর দৌড় হয় তাহলে এমন সীমিত ও ক্ষীণ চক্ষু কি সেই সুমহান 'আল্লাহ'কে দেখতে সক্ষম হবে?

আসুন আমরা আবার ভেবে দেখি।

এ বিশাল বিশ্ব। কার ক্ষমতা যে তার আয়তন নির্ণয় করে। কল্পনাতীত দিগন্ত-প্রসারী লক্ষ-লক্ষ ছায়াপথ এই বিশ্বে। প্রত্যেক ছায়াপথে রয়েছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্ররাজি। আমরা যে ছায়াপথের এক গ্রহ পৃথিবীতে বাস করি তাকে 'মিলকী ওয়ে' বলে। সূর্যও ঐ মিলকী ওয়ের লক্ষ-কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নক্ষত্র মাত্র।

আমাদের ও সূর্যের মাঝে ব্যবধান প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল;

যে ব্যবধান অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট। কারণ, আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল। গ্রহ ব্যতীত আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে আমাদের নিকটে আলো পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৪ বছর ৫ মাস! কতক নক্ষত্র আছে যার আলো আমাদের নিকট ১ শত বছরে, কতকের ১ হাজার বছরে , কতকের ১০ লক্ষ বছরে এবং কতকের তো ৬ বিলিয়ন বছরে পৌঁছে থাকে! অথচ আলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার (বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) বেগে পথ অতিক্রম করে থাকে। সুতরাং ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী কোথায় অবস্থিত তা অনুমেয়!

আসুন, আমার সাথে আল্লাহর বাণী পাঠ করুন; তিনি বলেন,

﴿ ﴾

"আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থান ক্ষেত্রের। অবশ্যই এ এক মহা শপথ -যদি তোমরা জানতে।" *(কুঃ ৫৬/৭৫-৭৬)*

এখন আমরা জানতে পারলাম যে, মহান প্রভু যার নামে শপথ করেছেন সেই নক্ষত্রমালার অবস্থান ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃতই কত বিশাল এবং কত সুদূরপ্রসারী!

পক্ষান্তরে এই সমস্ত নক্ষত্ররাজি নিকটবর্তী প্রথম আকাশে অবস্থিত। আল্লাহ পাক বলেন, "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদের করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।" *(কুঃ ৬৭/৫)*

এই সুশোভমান নক্ষত্র-প্রদীপমালার পর রয়েছে প্রথম আকাশ, অতঃপর তার বেধ বা স্থূলতা। অতঃপর প্রথম আকাশ ও দ্বিতীয়

আকাশের মাঝে দূরত্ব, অতঃপর রয়েছে দ্বিতীয় আকাশ এবং এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম আকাশ। অতঃপর আছে রহমানের কুরসী। যা এই সপ্ত আকাশমণ্ডলীকে পরিবেষ্টন করে আছে। কুরসীর তুলনায় এই সপ্ত আকাশ একটি ঢালে ৭টি দিরহাম (মুদ্রা) এর মত! আর এ কুরসী মহান প্রভুর পা রাখার স্থান। এর উপরে রয়েছে বিশাল আরশ। যার তুলনায় কুরসী এবং সাত আসমান মরুভূমিতে পতিত একটি বালার মত! যেমন হাদীস শরীফে এবং সলফদের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। এই মহা আরশের উপর আল্লাহ বিরাজমান আছেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! (তিনি সবচেয়ে মহান।)

অতএব কি চায় এ কাফেরদল?

তারা ঈমানের উপর শর্তারোপ করে এই দাবী করে যে, তারা সেই চক্ষু দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বে মহা আরশে বিরাজমান মহান আল্লাহকে দেখবে যে চক্ষু দ্বারা তারা পার্শ্ববর্তী রুমে কি আছে তা দেখতে পায়না। যদ্দারা আকাশের সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখতে পায়না এবং যে চক্ষু দ্বারা তারা তাদের দেহ-সংলগ্নে অবস্থিত হাওয়াকে দেখতে পায় না যা পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত!

লোকেরা মনে করে সুমহান আল্লাহকে দেখতে তাঁর জ্যোতিকে তাদের চক্ষু সহ্য করে নেবে যে চক্ষু দ্বারা তারা সূর্যের বৃত্তি দেখতে ও তার কিরণকে সহ্য করতে পারে না!

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।" *(কুঃ ২৪/৩৫)* তিনি মূসা আলাইহিস সালামের তাঁর দর্শনলাভ কাহিনী কুরআনে বর্ণনা

করেন। তাঁর 'কওম' তাঁর নিকট আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়েছিল। তিনি যখন আল্লাহর সহিত কথা বলেন তখন তাঁকে দর্শন দেওয়ার আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানালেন যে, 'তুমি তাঁকে দেখতে সমর্থ নও।' এবং কার্যক্ষেত্রে এক পরীক্ষা দ্বারা তাঁকে সুনিশ্চিত করে জিজ্ঞাসুদের জন্য এক নিদর্শন রাখলেন। আল্লাহ বলেন, "মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" *(কুঃ ৭/১৪৩)*

সুতরাং এই ঘটনায় দেখতে পাই যে, পাহাড় আল্লাহর জ্যোতি সহ্য করতে পারে না। তাহলে কাফেরদল কেমন করে সেই চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দর্শন করতে চায় যে চক্ষুতে প্রদীপের আলো বা সূর্যের কিরণ সরাসরি তার দিকে দৃকপাত করে সহ্য করতে পারে না।

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি আল্লাহকে দেখেছেন কি?' উত্তরে তিনি

বললেন, 'জ্যোতি, কেমন করে তার দর্শন পাব?'

তিনি আরো বলেন, 'তাঁর অন্তরাল জ্যোতি। যদি তা উন্মোচন করেন তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে দগ্ধীভূত করে ফেলবে। *(মুসলিম)*

আল্লাহু আকবার! এ জগতে তাঁকে দেখার সাধ্য কার আছে? দেখতে চাওয়া তো মূর্খামি, ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমি। না দেখে ঈমান না আনা সত্যের অপলাপ করা। যেহেতু ওরা জানে যে, তাদের এ দৃষ্টিশক্তি অসমর্থ, ক্ষীণ ও সীমিত। পক্ষান্তরে ওরাই এমন বহু দৃশ্য বিষয়-বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যায়নের জন্য কোন শর্ত লাগায় না। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ প্রত্যহ কত শত তথ্য ছাত্রদের সম্মুখে পেশ করে থাকেন; যা ছাত্ররা কোনদিন দর্শন করে না অথচ তারা তা বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলীদের সব কথাই কাফেররা প্রত্যক্ষ দর্শনের শর্ত ছাড়াই বিশ্বাস করে ও মানে।

অবশ্য একথা ওরা বলতে পারে যে, এসব বিশ্বাস্য তথ্যের প্রমাণ দৃশ্য না হলেও তার পশ্চাতে কোন লক্ষণ, চিহ্ন বা প্রভাব দেখা যায়, যা দেখে বা অনুভব করে অনুধাবন করা যায় যে, সে তথ্য সত্য। তাপ বরফকে বিগলিত করে -এটা এক তথ্য। এক্ষেত্রে যদিও তাপ ও তার সত্তাকে না দেখা যায় তবুও এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে তাপই বরফ গলায়। যেহেতু তাপের লক্ষণ ও প্রভাব অনুভূত। বেতার তরঙ্গ (হাওয়াতে ইথর) বেতার কেন্দ্র থেকে শব্দ ধরার যন্ত্র (রেডিও, টিভি)তে শব্দ পৌঁছিয়ে থাকে। যদিও বা হাওয়া, তার

তরঙ্গ ও ইথর চোখে দেখা যায় না তবুও হাওয়া ও তার তরঙ্গাদির লক্ষণ, আভাস ও চিহ্ন অনুভূত হয়। যা অনুধাবন করে এ তথ্যকে অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান ও মন তাকে সত্য বলে জানে।

তদনুরূপ আমরাও তাই বলতে পারি যে, আল্লাহ অদৃশ্য হলেও তাঁর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস আনার জন্য ঠিক ঐ পদ্ধতি ও পথের অনুসরণ যথেষ্ট যে পদ্ধতি ও পথের অনুসরণ করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং তাঁকে জানার জন্য এ বিষয়ে আস্থাভাজন বিশেষজ্ঞ রসূলগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যাঁদের শেষ এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য মান্য রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। যাঁর বিশ্বনবী হওয়ার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রভাব ও আভাস পরিলক্ষণ করা উচিত, যা আকাশ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তাই তো সারা সৃষ্টি জগতে হিকমত হাকীম ব্যতীত, নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্তা ব্যতীত, বিধান বিধায়ক ব্যতীত, নিয়ম নিয়ামক ব্যতীত, জ্ঞান জ্ঞানী ব্যতীত, অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞ ব্যতীত, রূপ রূপকার ব্যতীত, শিল্প শিল্পী ব্যতীত কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু অহংকার ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও মূর্খতা এ সবকিছুর মূলে প্রতিবন্ধক। “ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল।” *(কুঃ ২৭/১৪)*

এই ধরনের মানুষদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “এভাবেই আমি অপরাধিগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। ওরা বিশ্বাস স্থাপন

করবে না যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে।” *(কুঃ ২৬/২০০-২০১)*

আসুন চিন্তা করুন। আরো চিন্তা করুন। চিন্তা করে দেখুন, মানুষ আজ কত কি করতে পেরেছে। চাঁদের পিঠে পা রেখেছে, মহাশূন্যে উপগ্রহ ছেড়েছে। কমপিউটার আবিষ্কার করেছে; মানুষের ব্রেন যা করতে পারে না এই কমপিউটার তা পারে। ঘরের কোণে বসে পৃথিবী দর্শন করেছে, ইলেক্ট্রিসিটী ও এ্যাটমিক পাওয়ার সৃষ্টি করেছে, সূর্যরশ্মি থেকে ‘পাওয়ার’ তৈরী করেছে- আরো বহু কিছু কত ক্ষমতা মানুষের! সত্যই বিস্ময়কর ক্ষমতা।

কিন্তু চিন্তা করে দেখুন যে, যে মানুষের এত ক্ষমতা সেই মানুষকে যিনি নাস্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ব্রেন ও বিজ্ঞান দান করেছেন তাঁর কত ক্ষমতা? মানুষ বহু কিছু আবিষ্কার করেছে, বহু কিছুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে; কিন্তু কিছু সৃষ্টি তো করতে পারে নি। পরিধানের পোষাক তৈরী করেছে সুতা থেকে, সুতা তৈরী করেছে তুলা থেকে, কিন্তু তুলা তো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে নি। বিভিন্ন পদার্থ ও ধাতুর মাঝে ধর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বিভিন্ন যান্ত্রিক আসবাব-পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু ধাতু ও পদার্থ এবং তার মাঝে নিহিত ধর্ম তো মানুষের সৃষ্টি নয়। তা তো সেই আল্লাহরই সৃষ্টি।

চিন্তা করুন, আর খুব চিন্তা করুন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে। চিন্তা করুন মেঘ-বৃষ্টি ও বিদ্যুত নিয়ে। চিন্তা করুন মহাসমুদ্র ও তার বিশালতা, দুর্নিবার তরঙ্গমালা ও রকমারি জীবজন্তু নিয়ে। ভেবে দেখুন আগ্নেয়গিরি নির্ঝর,

জলপ্রপাত, নদ-নদী, মরু, পর্বত, বৃক্ষ ও তার ফল-ফুল নিয়ে। আরো চিন্তা করুন আপনার নিজ দেহ নিয়ে। দেখুন, এসব আপনাকে তাদের সৃষ্টিকর্তার সন্ধান বলে দেবে। প্রতিপালক আল্লাহকে পেয়ে যাবেন যদি আপনি প্রকৃত জ্ঞানী হন।

"নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে।"

এই চিন্তার পর সে বিস্মিত হয়ে বলতে বাধ্য হয় "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি।" *(কুঃ ৩/১৯০-১৯১)*

আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং তিনিই বিশ্রামের জন্য রজনী এবং (মাস ও বছর) গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ) কর্তৃক সুবিন্যস্ত। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিষদভাবে বিবৃত করেছেন। আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ বিষদভাবে বিবৃত

করেছেন। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করেন পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা সৃষ্টি করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন। আর আঙুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করেন এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এগুলিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।” *(কুঃ ৬/৯৫-৯৯)*

“নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচলকারী জাহাজের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে যে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়েছেন তার মধ্যে, আর বায়ু সকলের প্রবাহের মধ্যে (দিক পরিবর্তনে) এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অধীনস্থ মেঘমালার মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য (আল্লাহর মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে।” *(কুঃ ২/১৬৪)*

“তাঁর নির্দশনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর

সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হল, রাত্রে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদের্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুত দেখান, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তা দিয়ে ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হল, তাঁর আদেশমতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে ওঠার জন্য আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।" *(কুঃ ৩০/২১-২৬)*

"মৃত ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে। ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ; যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। রজনী ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে দিবালোক অপসারিত করি; ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরে। এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে

আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুর কাঁদির ডাঁটার আকার ধারণ করে। সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রজনী দিবসকে অতিক্রম করে না। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদেরকে বোঝাই জলজানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে।” *(কুঃ ৩৬/৩৩-৪২)*

বিভিন্ন ছড়িয়ে থাকা নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হল জ্ঞানীর কাজ। বস্তুতঃ জ্ঞানী মানুষেরাই সে চিন্তা করে থাকেন।

“তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার
বসি বাতায়নে।
সুন্দর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখ মনে।”

সত্যের সন্ধানে

সত্য ও সৎপথ যদিও সুন্দর ও স্পষ্ট তবুও মানুষ তা চিনতে ভুল করে বসে। সত্য মানুষকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করলেও মানুষ সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। অনেক সময় তার ওজর বা আপত্তি থাকে অথবা থাকে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধক। নতুবা থাকে মনের গহীনে সন্দেহের নিবিড় অন্ধকার। তাই প্রয়োজন পড়ে এমন আলোকবর্তিকার ; যে তার সেই অন্ধকার দূরীভূত করে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে দেয় মনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে। নির্দেশ করে সত্য ও সঠিক পথের দিকে।

তাছাড়া মানুষের জ্ঞান আছে। কিন্তু সকলের জ্ঞান সমান নয়। সকলের জ্ঞান ও মনের চিন্তাধারা একরূপ নয়। কোনও বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় এবং উন্নত চরিত্র সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু মতবাদ গড়ে তোলা নিজে নিজে সম্ভব নয়। প্রয়োজন কোন নির্দেশিকার। আর সে নির্দেশিকা হবে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান যদি ভুলে ভরা হয় তাহলে জানা কথা যে, মানুষের স্বরচিত বা স্বকপোলকল্পিত কোন নির্দেশিকা সঠিক মত ও পথের সন্ধান দিতে পারে না। সুতরাং এমন এক নির্দেশিকার দরকার যা হবে মানবীয় জ্ঞান-দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

অতএব কোন্ পথে মঙ্গল ও মুক্তি আছে, কোন পথে মোক্ষলাভ সম্ভব তা কোন মানুষের নির্দেশনায় ভুলও হতে পারে। অবশ্য

মানুষের তথা সারা সৃষ্টির সৃজনকর্তা অথবা তাঁর তরফ থেকে প্রেরিত মহামানবের নির্দেশনা যে ভুল ও ত্রুটিমুক্ত তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সেই আসমানী পথনির্দেশ ছাড়া যারা কোন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জ্ঞানের দাবী করে তা আসলে তাদের জ্ঞান নয় বরং তা হল অনুমান। আর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন, " ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই ; মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল অনুমান করে কথা বলে।" *(সূরা জাসিয়া ২৪ আয়াত)*

কিয়ামতে বিচারের সময় মানুষের বিরুদ্ধে যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর নিকট সাক্ষি দেবে তখন মানুষ তার প্রতিবাদ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে, "তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না - এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।" *(সূরা ফুস্‌সিলাত ২২-২৩ আয়াত)*

আল্লাহর নির্দেশিত পথই যে সত্য এবং অন্যান্যের পথ যে মিথ্যা ও কল্পিত তা তিনি স্পষ্টাকারে ঘোষণা করে বলেন, "বল, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) অংশীদার কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল, আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। সুতরাং যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি অনুসরণের অধিকতর

অধিকারী, নাকি সে, যাকে পথ দেখানো ছাড়া নিজে নিজে পথ খুঁজে পায়না? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক? (আসলে) ওদের অধিকাংশ লোকই অনুমানের অনুসরণ করে। আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমান কোন কাজে আসে না।" *(সূরা ইউনুস ৩৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, (যারা মনে করে ফিরিশ্তাবর্গ আল্লাহর কন্যা) তারা তো অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।" *(সূরা নাজ্‌ম ২৩ আয়াত)*

"অথচ এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের কোনই মূল্য নেই।" *(ঐ ২৮ আয়াত)*

মানুষ যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন তার মধ্যে এমন প্রকৃতি আছে যা আল্লাহ প্রকৃতি। তিনি সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। সে যদি এ যোগ্যতাকে কাজে লাগায় তাহলে স্রষ্টা তথা সত্যের পথ বেছে নিতে পারে। আল্লাহ বলেন, "তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি; যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *(সূরা রূম ৩০ আয়াত)*

শুধু মানুষই নয়; বরং সমগ্র জীব-জগৎকে তিনি এমন যোগ্যতা ও প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যার দ্বারা সকলেই ভালো-মন্দ, সৎ-

অসৎ, উপকারী-অপকারী চিনতে পারে। "তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথপ্রদর্শন (প্রকৃতি নির্ধারণ) করেছেন।" *(সূরা ত্বা-হা ৫০ আয়াত)*

তিনি মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, সে ফুলের কেশর থেকে মধু আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। অনুরূপ তিনি মানুষের প্রকৃতিতেও এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে এবং তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে।

অবশ্য এই প্রকৃতি-ক্ষমতা ও যোগ্যতাকেও কাজে লাগাবার, অন্য কথায় সেই যোগ্যতা ও প্রকৃতি অনুসারে সৎপথ লাভ করার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন ঃ-

১- আল্লাহর দেওয়া ঐ চিন্তাশক্তিকে ব্যয় করা। আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণ শক্তিকে নির্ভুল ব্যবহার করা। এমনিতেই নির্ভুল চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ও জাগ্রত-বোধ মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম। অধিকাংশ মানুষই কোন-কিছুকে নিয়ে সঠিক ভাবনা-চিন্তা ও বিবেক-বিবেচনা করতে আলস্য বোধ করে। তারা প্রকৃতির বাহ্যিক রূপটাই শুধু চোখ ভরে দেখে, কিন্তু তার প্রচ্ছন্ন দিকটাকে মনভরে দেখে না। বাগানের সুন্দর ফুলগুলিকে ফুটতে দেখে সকলেই আনন্দ ও সুখ উপভোগ করে। কিন্তু সে ফুল কেন ফোটে, কি করে ফোটে, সে ফুলের বাহার ও সৌন্দর্য এল কোত্থেকে ইত্যাকার নানান্ বিষয় নিয়ে চিন্তা করে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিই। ফলে সকাল তো আসে সকলের জন্য। কিন্তু

সকালের সেই উজ্জ্বল জ্যোতি ও আলো দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই; যারা রাতের আলস্য ও নিদ্রাঘোর কাটিয়ে চোখ মেলে উঠে পড়ে। নচেৎ যারা ঘুমিয়েই থাকে তাদের জন্য সকাল সকাল নয়; গভীর রাত। মানুষের এই অবজ্ঞার প্রতি অভিযোগ এনে কুরআন বলে, --

﴿ ﴾

অর্থাৎ- আকাশ ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শনাবলীকে লোকেরা এমনিই অতিক্রম করে যায়। এবং সে সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না *(সূরা ইউসুফ ১০৫ আয়াত)*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আর লোকদের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন।" *(সূরা ইউনুস ৯২ আয়াত)*

পক্ষান্তরে আল্লাহ চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যই তাঁর নিদর্শনাবলীকে ব্যক্ত করেন। *(সূরা আ'রাফ ৩২, তওবা ১১, ইউনুস ৫,২৪, রূম ২৮ আয়াত)*

আর প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হন কেবল এই শ্রেণীর মানুষরাই। এঁরাই সৎপথপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

অপরদিকে যারা নিজেদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করে না এবং সত্য জানতে যারা আগ্রহী নয় তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহু লোককেই দোযখের ইন্ধনরূপে সৃষ্টি করেছি। তাদের অবস্থা হল এই যে, তাদের অন্তর আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা বুঝার চেষ্টা করে না, চোখ আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা দেখে না, কান আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা শোনে না। তারা হল পশুর মত। বরং তার চাইতেও অধিক গোমরাহ। আর তারাই হচ্ছে উদাসীন জীব।" *(সূরা*

আ'রাফ ১৭১ আয়াত)

২- মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সুস্থ ও নির্মল থাকা এবং তা পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কোন প্রকার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বিকৃত না হওয়া। মানুষের প্রকৃতি সৃষ্টিগতভাবে থাকে সুন্দর ও নির্মল। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রকৃতিকে বিকৃত অথবা সমৃদ্ধ করে তার পরিবেশ। কারণ, যে পরিবেশে সে প্রতিপালিত হয় সে পরিবেশের ভাবধারা ও প্রকৃতি নিয়ে সে গড়ে উঠে। ফলে তার পরিবেশের মানুষ যেরূপ হয় সেও সেইরূপ মানুষরূপে বিকাশ লাভ করে। তারা সত্যের আলোর অন্তরালে থাকলে সেও মিথ্যার অন্ধকার ভেদ করে উঠতে পারে না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "প্রতেক শিশুই (সত্য ও ইসলামের) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা (নিজেদের সংস্রব ও তরবিয়ত দ্বারা) তাকে ইয়াহুদী বানিয়ে দেয় অথবা খ্রীষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে কি তোমরা কোন কানকাটা (বাচ্চা) দেখতে পাও? (কিন্তু পরবতীতে লোকেরা তার কান কেটে, নাক
ফুঁড়িয়ে বিকৃত করে দেয়।) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০নং)*

৩- সত্যের সন্ধানে থেকে কারো অন্ধানুকরণ না করা, কারো প্রতি অন্ধভক্তি না রাখা। এরূপ হলে সত্যের নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা, সত্য জানার আগ্রহটুকুও তার হৃদয়ে জন্মাবে না। জ্ঞান থাকতেও সে জ্ঞান বিফল হয়ে যাবে। অন্ধভক্তির চাপে তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। বরং নির্বিচারে ভক্তিভাজনের সেই মিথ্যাই তার জীবনের অবলম্বন ও মোক্ষলাভের শেষ, শ্রেষ্ঠ ও

একমাত্র পথরূপে বিবেচিত হবে।

এ অবস্থা হয় দাদুপন্থী ও অন্ধভক্ত সন্তান ও শিষ্যদের। তারা সেই অন্ধভক্তির এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, “যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ও রসূলের প্রতি তোমরা অগ্রসর হও (তা মান্য কর) তখন তারা বলে, ‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ যদিও তাদের বাপ-দাদাগণ কিছুই জানত না ও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না তথাপিও।” *(সূরা মা-ইদাহ ১০৪ আয়াত)*

এইভাবে যারা চিরাচরিত প্রথার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় তারাও সত্যের কাছে পৌঁছতে সক্ষম নয়।

৪- প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী তথা স্বেচ্ছারিতার পূজারী না হওয়া।কারণ সকল বুদ্ধিমতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির হাতে এমনই বন্দী থাকে যেমন কোন বেশ্যার হাতে যুবক। অতএব মানুষের মাঝে এমন সত্যপ্রিয়তা এবং সত্য জানার প্রবল বাসনা ও তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে যে, সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তি পরাভূত হবে। নচেৎ সত্যের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি ও মনের প্রবণতা কাজ করলে সত্যের মহিমা ধরা দেবে না। বরং বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলেও প্রবৃত্তিবশে জেনে-শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করে বসবে। প্রবৃত্তি পূজা সত্যের পথে এমন এক বড় ডাকাত যে, মানুষ তার ফলে সে পথে চলতে মোটেই প্রেরণা পায় না। এ জন্যই আল্লাহ পাক বলেন, “অতঃপর ওরা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর

অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত আর কে?” *(সূরা ক্বাসাস ৫০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, “সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তাহলে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ওদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” *(সূরা মুমিনূন ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, “(হে মুহাম্মদ!) তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছ, যে নিজের খেয়াল-খুশীকে মা’বুদ বানিয়ে নিয়েছে? কিন্তু (সে যখন এইরূপ করেছে তখন) আল্লাহও তাকে (হেদায়াতের উপযুক্ত নয়) জেনেই পথভ্রষ্ট করেছেন, তার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” *(সূরা জাসিয়া ২৩ আয়াত)*

৫- সত্য তথা সত্যের ধারক ও বাহকের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। কারণ, হিংসুকের মনে সর্বদা প্রতিপক্ষের ক্ষতি ও ধ্বংস-কামনাই থাকে। সুতরাং হিংসা বর্জন না করতে পারলে সত্যানুসন্ধ্যানী সত্যের নাগাল পাবে না। সত্যের ধারক ও বাহক গরীব শ্রেণীর হলে অথবা উচ্চবংশীয় বা স্বজাতীয় না হলে ধনী ও উচ্চবংশীয় যদি তার প্রতি হিংসা করে তবে তো সত্যানুসন্ধানী চিরকাল মিথ্যার বন্যাতেই হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং ক্ষতি করবে নিজেরই। এই তত্ত্ব কুরআন মাজীদে কয়েক স্থানে

বর্ণিত হয়েছেঃ-

"তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে আর তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ঈর্ষান্বিত হয়ে তা তারা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এই কারণে যে , আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ (সত্য ও নবুঅত দান) করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা বাকারহ ৯০ আয়াত)*

"--অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে (মুহাম্মদ ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে) যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের প্রতি ঈর্ষা করে? হযরত ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো ধর্মগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। অতঃপর কিছু লোক তাতে (যবূর, তওরাত, ইঞ্জিলে) বিশ্বাস করেছিল এবং কিছু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বস্তুতঃ দগ্ধ করার জন্য দোযখই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব; যাতে তারা (চিরস্থায়ী) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করাব ; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্রা সঙ্গিনী। আর তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান দান করব।" *(সূরা নিসা ৫৪-৫৭)*

"---যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে নিশ্চিতরূপে সে

বেহেশ্তের পথ হারায়। হিংসামূলক মনোভাবশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও (ধর্মীয়) গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) অবিশ্বাসীরূপে ফিরে পেতে আকাঙ্খা করে।---।” *(সূরা বাক্বারাহ ১০৮-১০৯)*

ছোট-বড় ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত প্রভৃতি সত্য মিথার কোন মাপকাঠি নয়। মাটিতে মণি-কাঞ্চন পড়ে থাকলে মণি-কাঞ্চনের মূল্য ও কদর অবশ্যই কমে যায় না। পরন্তু মাটিতে পড়ে আছে বলে যে ব্যক্তি তা কুড়িয়ে নিতে চায় না সে নিছক বোকা বৈ কি?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সভায় গরীব দেখে ধনীরা বলেছিল, “আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ এদের প্রতিই কি অনুগ্রহ করলেন?” *(সূরা আনআম ৫৩ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তারা সত্য গ্রহণ করতে পারেনি - কেবল হিংসা ও অহংকারের ফলে।

৬- সত্য গ্রহণের জন্য হৃদয়কে সদা উদার ও উন্মুক্ত রাখা, হৃদয়ের সমস্ত রকমের তালা খুলে দেওয়া, কোন প্রকারের অহংকার, উন্নাসিকতা হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যকে মনে স্থান না দেওয়া। কারণ মনের মাঝে এসব থাকলে যে হক ও সত্য কেউ গ্রহণ করবে না তা বলাই বাহুল্য। এই ঔদ্ধত্যের ফলে যে সর্বপ্রথম সত্য স্বীকার করেনি সে হল উদ্ধত ইবলীস। যখন আল্লাহ তাকে আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালামকে সিজদা করার জন্য আদেশ করলেন তখন অহংকারভরে সে বলেছিল, “আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে অগ্নি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর ওকে

সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে!” *(সূরা আ’রাফ ১২, সূরা স্বাদ ৭৬ আয়াত)* অতঃপর তার পরিণাম কি হয়েছিল তা তো তার ‘শয়তান’ নামেই জানতে পারা যায়।

যেমন আল্লাহর নিদর্শনাবলী উপেক্ষা করেছিল উদ্ধত ফিরআউন। মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে একাধিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ ও সত্য মনে করেও তা শুধু অহংকারবশে মেনে নেয় নি। “----ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার (আল্লাহর) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এল তখন ওরা বলল, ‘এ তো সুস্পষ্ট যাদু! ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করল; যদিও ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? *(সূরা নাম্‌ল ১২-১৪ আয়াত)*

এমন অহংকারে সত্য অগ্রাহ্যকারীদের অবস্থা পরকালে কি হবে তা তো বলাই বাহুল্য। কুরআন মাজীদে এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “ওরা (ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী) সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপ করে থাকি। ওদের নিকট ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’ বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, ‘আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যসমূহকে বর্জন করব?’ বরং (মুহাম্মদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছিল। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।” *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ৩৩-৩৮ আয়াত)*

যারা অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন করে তারা কখনই সৎপথের দিশা

পায় না। “যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় তাদের একাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। *(সূরা মু'মিন ৩৫ আয়াত)* “যারা আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার; যা অর্জনে তারা সফল হবে না।” *(ঐ ৫৬ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা সত্য জানার জন্য নমনীয়তা ও বিনয় প্রদর্শন করে তারা অচিরে সত্যের সাক্ষাৎ পায়। যেমন যুগে-যুগে বহু পন্ডিত, পুরোহিত, যাজক ও পাদ্রী সত্যের সন্ধান পেয়ে বিনয়ের সাথে সাগ্রহে সত্য গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এই শ্রেণীর মানুষদের প্রশংসা করে কুরআন বলে, “--- এবং যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন যে (আগত) সত্য তারা উপলব্ধি করেছে তার দরুন তুমি তাদের চক্ষুকে অশ্রু-বিগলিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করলাম। অতএব তুমি আমাদেরকে (সত্যের) সমর্থকদের দলভুক্ত কর। আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহতে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকতে পারে?’ অতঃপর তাদের একথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন বেহেশ্ত; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। যারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।” *(সূরা মা-ইদাহ ৮৩-৮৫ আয়াত)*

এ ছাড়া অনুদার হঠকারী যে সত্যের নাগাল পায় না তা বলাই বাহুল্য।

“দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি,
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।”

৭- সকল প্রকার বক্রতা ও ব্যাধি থেকে হৃদয় পবিত্র থাকা। কারণ, বক্র ও ব্যাধিগ্রস্ত মন সত্যের নিকট পৌঁছতে সক্ষম নয়। অন্তরে টেরামী থাকলে এবং সরলতা অবলম্বন না করলে সৎপথ পাওয়া দুঃসাধ্য। কেননা সৎপথ আছে সরলতায়, বক্রতায় নয়। টেরা লোকদের মনেই থাকে নানান কুটিলতা। তাই তো কুরআন বলে, “যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফেৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে (কুরআনের) যা রূপক (আয়াত) তার অনুসরণ করে।” *(সূরা আ-লি ইমরান ৭ আয়াত)*

অবশ্য যারা বক্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে আরো বক্র করে দেন। ফলে এমন লোকেরা সত্য থেকে আরো দূরে সরে যায়। তিনি বলেন, “স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত (রসূল)।’ অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” *(সূরা স্বাফ্ফ ৫ আয়াত)*

অনুরূপ যার হৃদয়ে ব্যাধি আছে সেও সত্যের সাক্ষাৎ পেতে পারে না। কেন না, রোগাক্রান্ত কোন বৃক্ষই ফল-ফুলে সুশোভিত হতে

পারে না। আর এই ব্যাধির জীবাণু হল সন্দেহ ও কপটতা। অর্থাৎ সত্যের প্রতি সন্দেহ ও কপটতা পোষণ করলে সত্য নিশ্চয়ই ধরা দেবে না। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, "আর যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে এ (অবতীর্ণ সূরা) তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটে।" *(সূরা তাওবাহ ১২৫ আয়াত)*

আরো এক শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ওদেরকে আহ্বান করা হলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটে আসে। ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী।" *(সূরা নূর ৪৮-৫০ আয়াত)*

এমন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ব্যাধি যেহেতু নিজেদের আনীত, তাই শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের ব্যাধির উপর ব্যাধি বর্ধিত করেছেন। এই শ্রেণীর কপট মানুষরা আল্লাহ ও বিশ্বাসীগণকে প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা বুঝে না যা যে, তারা আসলে নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। "তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহর তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী ।" *(সূরা বাক্বারাহ ১০ আয়াত)*

৮- সত্যের পথে ত্যাগ স্বীকার করা। প্রয়োজনে কিছু কুরবানী ও উৎসর্গ করা। সত্য গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে বিসর্জন দিতে হবে সকল

প্রকার লোভ-লালসা, মায়া-মমতা ও প্রেম-আসক্তিকে। কারণ, এমনও হতে পারে যে, সত্য গ্রহণ করলে ত্যাগ করতে হবে কিছু পার্থিব স্বার্থ, অথবা পদ ও গদি, অথবা একান্ত আপন জন আত্মীয়-স্বজনকে (যদি তারা এ সত্য গ্রহণে সহানুগামী না হয় তবে), বিসর্জন দিতে হতে পারে চাকুরী, সুন্দর বাড়ি, জমি-জায়গা, সহায় সম্পদ প্রভৃতি, ত্যাগ করতে হতে পারে স্বজাতি ও স্বদেশকে। সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সর্বপ্রকার আকর্ষণ এড়িয়ে হাজারো বাধা-বিঘ্ন উল্লংঘন করে, শত-সহস্র আপদ-বিপদের মাঠ-ময়দান পার হয়ে, বিভিন্ন প্রহসন ও অত্যাচারের নদী-জঙ্গল অতিক্রম করে তবেই সত্যের রাজপথ লাভ করতে হতে পারে। সুতরাং যে বীর নারী-পুরুষ শুধু সত্যের খাতিরে এসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে বিপদের পথ চলতে ভয় না করে সেই পায় সত্যের আলো।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে মানুষ! আল্লাহ প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে জাহান্নামী করার জন্য (নিজের আনুগত্যের প্রতি) আহ্বান করে।” *(সূরা ফাত্বির ৫-৬ আয়াত)*

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমান (বিশ্বাস) অপেক্ষা কুফরী (অবিশ্বাস)কে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অভিভাবক করে; তারাই অপরাধী। বল, ‘তোমাদের পিতা-পুত্র,

ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদ সমূহ এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তদীয় রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর আদেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। ” *(সূরা তাওবাহ ২৩- ২৪ আয়াত)*

শেষ পথ

সারা জাহানের বিশ্বপ্রভু এক। মানুষের সৃষ্টি উপাদানও এক। সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এক। পাপ-প্রতিদানও এক। যে সৃষ্টিকর্তা জান্নাত-জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন তাঁর দায়িত্বে ছিল হেদায়াত পৌঁছে দেওয়া। কারণ, মানুষ পথ ভুল করে বসতে পারে। অথবা কোন প্রভাব-পরিবেশের চাপে সে সৎপথ বিস্মৃত হতে পারে। তাই কালে কালে তিনি তাঁর তরফ থেকে মহাপুরুষ নবীগণকে প্রেরণ করলেন। অবতীর্ণ করলেন পথনির্দেশিকা বিভিন্ন কিতাব। যে সকল ঐশীগ্রন্থে রয়েছে মুক্তির পথনির্দেশ। সকল আম্বিয়াকে সেই একক সৃষ্টিকর্তাই পাঠিয়েছেন একই নির্দেশ দিয়ে। আর তাঁরই নির্দেশাবলীর সর্বশেষ নির্দেশ ছিল তাঁর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। তাই তো বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থেও ইসলামের শেষ ও বিশ্বনবীর আনুগত্য করার কথা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং তা সত্ত্বেও যদি কেউ কোন স্বার্থ, হিংসা, প্রবৃত্তি বা ঔদ্ধত্যবশে তাঁকে স্বীকার ও বরণ না করে তবে

এটা তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক বৈ কি? এর জন্য তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে সেই একক সৃষ্টিকর্তার কাছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সেই নির্দেশের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে তারাই হবে অগ্নিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" *(সূরা বাক্বারাহ ৩৯ আয়াত)*

"হে মানব জাতি! যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন রসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শনসমূহ বিবৃত করবে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে (সৎপথের অনুসারী করে) সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই হবে দোযখবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে ?" *(সূরা আ'রাফ ৩৫-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "(বিচার দিবসে আমি ওদেরকে প্রশ্ন করব,) 'হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি; যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার

করলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ওদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর ওরা যে অবিশ্বাসী ছিল সে কথাও তারা স্বীকার করবে।" *(সূরা আনআম ১৩০ আয়াত)*

আল্লাহ পাক একক। ইসলাম তাঁর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম। এর মূল শিক্ষা হল একেশ্বরবাদ, একত্ববাদ। এই ধর্মের মহাপুরুষ হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। যিনি সেই সৃষ্টিকর্তারই ঘোষণা মতে বিশ্বনবী ও শেষ নবী। যে আল্লাহ ও মুহাম্মদের কথা রয়েছে মনুসংহীতায়, বাইবেলে ও আরো অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে। যে একত্ববাদের কথা ঘোষিত হয়েছে বেদ-পুরাণে, অভিব্যক্ত হয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর ব্যক্তিত্ব। সে সত্যকে যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন তাঁরাও ভাবার এই ধরন নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন। তাঁদের চিন্তার খোরাক পাবেন নিজেদের ধর্মগ্রন্থাবলীতেই।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানের সে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে অক্ষম। তাই তাদের সন্দেহের আবরণ উন্মোচন করার জন্য আরো এক পথ উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "(হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ (পুরুষ) মানুষকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে ঐশীগ্রন্থধারী (জ্ঞানী)দেরকে জিজ্ঞাসা কর, স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থ সহ।" *(সূরা নাহ্ল ৪৩-৪৪ আয়াত)*

অনুরূপ ভাবতে আহ্বান জানাই সেই ব্যক্তিবর্গকেও; যাঁরা মুসলমান নামে পরিচিত অথচ ইসলামের অনুবর্তী নন। আর তাঁদেরকেও;যাঁরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে আহ্বান করেন, সিজদা

করেন, অন্যের নিকট প্রার্থনা করেন, নযর ও মানত মানেন।

পরিশেষে মনে রাখার কথা যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা, শক্তিমত্তা, ধনবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান, অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি দৃষ্টি ও চিত্তাকর্ষক বিষয় হক ও সত্য জানার মানদণ্ড বা মাপকাঠি নয়। যেমন, ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে চিনতে চাওয়া ভুল। সঠিক হল সত্যের মাপকাঠিতেই ব্যক্তিকে চেনা।

নবীগণ ছাড়া মানুষ মাত্রই ভুলে ভরা। সত্যাশ্রয়ীদের মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা বলে তা দেখে সত্য প্রত্যাখ্যান করা সত্যানুসন্ধানীর জন্য উচিত নয়। যেমন মানুষ চিরদিন সমান অবস্থায় থাকে না। জীবনের উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের বিভিন্ন বিপর্যয়ের সাথে সাথে মানুষও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো ভুল করে ফেলতে পারে। আবার ঈমান পাকা হলে নাও করতে পারে। অতএব জীবনের কোন সন্ধিক্ষণে সত্যাশ্রয়ীকে ভুল করতে দেখে অথবা তার মাতা-পিতা বা স্ত্রী-পুত্র ভুল পথে চলে ব'লে তার সাথে যে সত্য রয়েছে তাও মিথ্যা ধারণা করা জ্ঞানীর কাজ নয়। সত্যাশ্রয়ীর বিগত ভুলের জের ধরে বর্তমানেও নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও সুন্দর খাঁটি সত্যকে অগ্রাহ্য করার আচরণ আসলে ফিরআউনী আচরণ। কুরআন মাজীদে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সমসাময়িক রসূল মূসা আলাইহিস সালাম যখন সত্য নিয়ে ফিরআউনের নিকট এলেন তখন ফিরআউন বলল, "যখন তুমি শিশু ছিলে তখন আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি? আর তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের

মাঝে কাটাও নি? তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ; তুমি হলে অকৃতজ্ঞ।' মূসা বললেন, 'আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করেছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল মনোনীত করেছেন।" *(সূরা শুআরা ১৮-২১ আয়াত)*

হযরত মূসা (আঃ) শৈশবে ফিরআউনের অনুগৃহীত ছিলেন। তার গৃহেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। অত্যাচারিতের সাহায্য করতে গিয়ে অত্যাচারীকে একটি ঘুষি মারলে ঘটনাক্রমে সে মারা যায়। মূসা (আঃ) এর এ হত্যাকান্ড ছিল অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তিপ্রসূত। এ ভুল মূসা (আঃ) নিজেও স্বীকার করেছিলেন এবং ভয়ে পালিয়েও গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহর নিকট এ অপরাধ ক্ষমার্হ ছিল, তাই তিনি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁকে নবুওয়াত দ্বারা ভূষিত করলেন। সুতরাং তাঁর নবুওয়াত দাবীর সত্যতায় সে বিগত ভুল কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি অবশ্যই করতে পারে না।

যা সত্য তা চিরন্তন। সার্বজনীন ও সর্বকালীন। চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ শক্তি আছে সত্যের। জং ও মরিচাহীন যে কোন লৌহ পদার্থ সদৃশ সন্ধানীদৃষ্টির মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে পারে সে; যদি না মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে।

ভেবে দেখার কথা, সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যদি একক হন, সকলের মালিক ও প্রতিপালক যদি এক হন তবে তিনিই সকলের জন্য একক উপাস্য হবেন না কেন? আর কেনই বা থাকবে পরস্পরবিরোধী নানা মত, নানা পথ, নানা ধর্ম?

ফল কথা, সৃষ্টিকর্তার বিধান তো এক। কিন্তু মানুষই সৃষ্টি করেছে এই নানান পথ ও মতকে। একথার সাক্ষ্য দিয়ে কুরআন বলে, “তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। *(সূরা মু'মিনূন ৫২-৫৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, “এই যে তোমাদের জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার উপাসনা কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। পরন্তু সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।” *(সূরা আম্বিয়া ৯২-৯৩ আয়াত)*

সেই সৃষ্টিকর্তার আরো একটি বাণী নিয়ে ভেবে দেখুন; তিনি বলেন, “মানুষ (আদিতে) ছিল একই জাতিভুক্ত। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন, আর যাদেরকে তা (কিতাব) দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারাই শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করল। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।” *(সূরা বাক্বারাহ ২১৩ আয়াত)*

সুতরাং আপনিও সেই একই জাতিভুক্ত বিশ্বাসী হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবেন কি?

আমাদের একান্ত কাম্য এই যে, সারা বিশ্ববাসী একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পথের সন্ধান পাক, সত্যাবলম্বী হয়ে সকলে মিলে ভাই-ভাই হয়ে যাক। শান্তি ফিরে আসুক অশান্তিময় নিখিল বিশ্বে, সুশোভিত ও সুখময় হোক পরকালের জীবন। শত মোবারক হোক আপনার মনের নতুন সংস্কার।
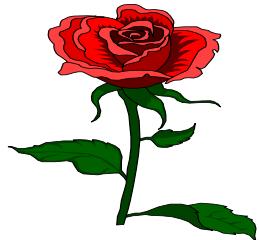
ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রত্যেক ময়দানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে।

২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিকে পরিপূর্ণ।

৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষকে সভ্যতা ও উন্নয়নের প্রতি আহবান করে।

৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মকে সত্য বলে সভ্য জগতের (বহু) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধ করা অতি সহজ।

৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের মূলনীতি হল, সমস্ত নবী-রসূল এবং ঐশীগ্রন্থকে সত্য বলে স্বীকার করা।

৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়-বস্তুতে পরিব্যপ্ত।

৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অধিক অধিক সরলতা ও নমনীয়তা বিদ্যমান।

৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সাক্ষ্য দেয় নিত্য-নতুন আবিষ্কার।

১০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল জাতি ও যুগের জন্য উপযোগী।

১১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অনুযায়ী সর্বাবস্থায় আমল করা সহজ।

১২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অতিরঞ্জন (সীমাতিরিক্ততা, অসংযম) ও অবজ্ঞা নেই।
১৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবিকল সংরক্ষিত ও অবিকৃত আছে।
১৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ।
১৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল প্রকার উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আদেশ দেয়।
১৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান সভ্যতার মূল উৎস।
১৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার অব্যর্থ ঔষধ হতে পারে।
১৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সভ্যতা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।
১৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম দ্বারা বিশ্বশান্তি কায়েম হতে পারে।
২০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিজ্ঞান-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ সহজ হতে পারে।
২১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল মানুষের জন্য অভিন্ন ব্যবহারিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে।
২২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম জাতপাত ও আতরাফ-আশরাফের ভেদাভেদের সকল প্রাচীর তুলে দিয়েছে।
২৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সামাজিক ও দাম্পত্য ন্যায়-নিষ্ঠা বাস্তবায়িত করেছে।
২৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি থেকে দূরে নয়।

২৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র প্রতিহত করে পরামর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি প্রণয়ন করেছে।
২৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শত্রুপক্ষের প্রতিও ন্যায় বিচার ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে।
২৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুসংবাদ দিয়েছে ঐশীগ্রন্থাবলী।
২৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম নারীকে মা, স্ত্রী ও কন্যা; তার সকল অবস্থায় যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।
২৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্ণ-বৈষম্যের অন্তরাল তুলে দিয়ে শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় এবং আরব-আজমের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।
৩০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শিক্ষাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয (আবশ্যিক) করেছে এবং শিক্ষা বা জ্ঞান গুপ্ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।
৩১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছে।
৩২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুস্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশাবলী আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুকূল।
৩৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ক্রীতদাসকে পাশবিক আচরণের হাত থেকে রক্ষা করেছে, প্রভুর সাথে সমতার মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং দাসমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
৩৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিবেক-বুদ্ধির স্থান রেখেছে এবং তার যুক্তিকে মেনে নিয়েছে।
৩৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ধনীর নিকট থেকে নির্ধারিত পরিমাণ ধন নিয়ে দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করে ধনী-গরীব উভয়কেই রক্ষা করেছে।

৩৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক হিকমত অনুযায়ী এমন আচার-আচরণ বা চরিত্র নির্ধারণ করেছে, যাতে প্রয়োজনে কঠোর হতে এবং প্রয়োজনে দয়ার্দ্র হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

৩৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সমগ্র সৃষ্টির প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে আদেশ করেছে।

৩৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর দেওয়ানী আইনের মৌলনীতি প্রণয়ন করেছে।

৩৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছে।

৪০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম হৃদয়, চরিত্র ও বিবেককে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে।

(ক্বাত্বারের শরয়ী আদালতের বিচারপতি শায়খ আহমাদ বিন হাজার আল বুত্বামী প্রণীত 'আল-ইসলামু অর্রাসূল ফী নাযারি মুনসিফীশ শারক্বি অল-গার্ব' ১১৭-১১৯পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত)